'আগামী দশকে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব'

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, *গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ পিএএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রথিতযশা এই অর্থনীতিবিদ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নিজেকে করেছেন সমৃদ্ধ। সমানুপাতে তিনি দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতেও অভিজ্ঞ। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি বর্তমানে দেশের অর্থনীতির ক্রান্তিকালে বলিষ্ঠ পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণসহ একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জসিম আহমেদ**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ চাপে বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের প্রভাবে বর্তমানে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা বা ক্রান্তিকাল চলছে। যাকে আপনি বলছেন অর্থনৈতিক গতি সুপারসনিকে যাওয়ার প্রস্তুতিকাল। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ : ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতা, মজুদদারবিরোধী অভিযান এবং বিশেষভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অপেক্ষাকৃত ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। তবে শস্য উৎপাদনে নিম্নতর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলত সেবা খাতের জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং শিল্প খাতের কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের কারণে '০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি বজায় থাকে। এ ছাড়া, অভ্যন্তরীণ (Internal) ও বহির্বিশ্বের (External) সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিক সামগ্রিকভাবে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা স্থিতিশীল এবং মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে।

দেশে পর পর দুবার বন্যা, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাত, পোলট্রি শিল্পে বার্ড ফ্লু'র মহামারী, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল, খাদ্যশস্যসহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে চাহিদা যোগানের মধ্যে ব্যত্যয় কাটিয়ে উঠে মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে রাখতে নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থাগুলো বিশেষভাবে সক্রিয় রয়েছে। দ্রব্যমূল্য বিশেষভাবে খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি সরকার মুখ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে আমদানি বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৫.৯%। এ সময়ে খাদ্যশস্য ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নিষ্পত্তির মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে যথাক্রমে ১৬৪.৫% ও ১৫.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যথাক্রমে ৯.৫% ও ১৬.৪% বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে দেশের রফতানি খাতে নানাবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্যে এ খাতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে রাজস্ব আদায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৪.৬% বা ২৩৪০৩.১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। রেমিটেন্স অতীতের যেকোনও সময়ের তুলনায় জানুয়ারি '০৮ মাসে সর্বোচ্চ ৭১৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ তারিখে) প্রাপ্ত তথ্য ও দেশে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫৮৬৪.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৫৫১.৩ কোটি ৩৬৭৫.৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের (২০০৭-০৮) প্রথম ছয় মাসে গত বছরের তুলনায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) কিছু (৪১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) কম হলেও এ সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ বেড়েছে মোট ১৬৭৩৫.৪ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই সময়ে বেড়েছিল ১১৪২০.০ কোটি টাকা। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি প্রকারান্তরে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি সচল থাকারই নামান্তর। সুতরাং বর্তমানে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন নির্দেশকের বিশ্লেষণে বলা যায় যে, অর্থনীতির কিছু খাতে (যেমন– রফতানি, কৃষি উৎপাদন, নির্মাণ খাত, এফডিআই) প্রবৃদ্ধির হার আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে, যাকে সংস্কারের প্রভাবে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা বা ক্রান্তিকাল চলছে বলা সঠিক নয়। বরং বিগত দেড় বছরে দেশে উপর্যুপরি প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে না এলে এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বহিঃঅর্থনীতির (External economy) চাপ (আন্তর্জাতিকভাবে খাদ্যশস্যসহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি) সৃষ্টি না হলে দেশে সামগ্রিকভাবে খাতভিত্তিক সুষম প্রবৃদ্ধি সঞ্চারিত হতো, যাকে অর্থনীতির ভাষায় উন্নয়নের 'উত্তরকাল' বলা যায়। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্রুত বেগবান হবে, কারণ অর্থনীতির মূল কাঠামো সুসংহত হচ্ছে।

২০০০ : ২০০৮ সালের শুরুতে এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম মাসে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন সূচকে নিম্নগতি- এর প্রেক্ষাপট কী? এ মন্দাভাব কীভাবে, কখন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে?

ড. আহমেদ : চলতি অর্থবছরের (২০০৭-০৮) প্রথম ছয় মাসে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) দাঁড়ায় ৩৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৪১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি বছরে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছুটা কম হলেও আলোচ্য অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে ঋণপ্রবাহ বিশেষ করে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি প্রকারান্তরে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি সচল থাকারই নামান্তর। সুতরাং দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ পরিস্থিতি মন্দা– কথাটি সঠিক নয়।

২০০০ : বিনিয়োগ পরিস্থিতি গত বছরের তুলনায়ও বেশ কম, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ বা কর্মপরিকল্পনা নেওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

ড. আহমেদ : বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশমুখী বিদেশি বিনিয়োগ যেখানে ৩১ মিলিয়ন ডলার ছিল, সেখানে ২০০৩ সালে তা ১৯৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এই বিনিয়োগ (এফডিআই) ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ৩৮৫ মিলিয়ন, ৮০০ মিলিয়ন, ৭৪৩ মিলিয়ন এবং ৭৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত ও উন্নীতকরণের জন্য বেশ কিছু বাজারভিত্তিক বিনিয়োগনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের ক্যাপিটাল মেশিনারিজের ওপর আমদানি শুল্ক হ্রাস, শতভাগ রফতানিমুখী রফতানিকারকদের জন্য আমদানি শুল্ক মওকুফ, প্রযুক্তিগত রেমিটেন্স ফি ও বৈদেশিক ঋণ এবং পোর্টফলিও বিনিয়োগকারীর লভ্যাংশের ওপর কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

দেশে বিদ্যমান কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যার হাউজের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্যব্যবস্থা উদারীকরণ ও শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী, আমদানি-রফতানিকারক সবার জন্য বিনিয়োগের মুনাফা ও মূলধন স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একই ধরনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগের আয় বা মুনাফা স্থানান্তরের কোনও সীমা এখন নেই এবং মূলধন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে টাকাকে সম্পূর্ণরূপে বিনিময়যোগ্য/কনভার্টেবল করা হয়েছে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি সরলীকরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ড এ ক্ষেত্রে তাদের নিবন্ধকরণ ও অন্যান্য সেবা/সার্ভিস প্রদান করে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের সরকারি খাতে বিশেষভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্যাস ও তেল উত্তোলন এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিস' যেখানে বিনিয়োগকারীদের শিল্প স্থাপনে অতি দ্রুত অবকাঠামোগত (যেমন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ সুবিধা, আমদানিকৃত মেশিনারি, যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামালের কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, পরিবেশ মন্ত্রণালয়/এজেন্সির ক্লিয়ারেন্স এবং শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় অন্যান্য সব সুবিধা) সেবা নিশ্চিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে বিনিয়োগ ব্যবস্থার নীতিনির্ধারণকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সহায়ক আইনি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ এখন আইনি কাঠামো, রাজস্ব, আর্থিক, বাণিজ্য, শিল্প এবং বৈদেশিক বিনিময় হার নীতি দ্বারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত; বাংলাদেশ সরকারও উক্ত নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। তদুপরি আমাদের দেশের অর্থনীতি গণতান্ত্রিক ও মুক্তবাজার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হওয়ায় এবং অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় বিনিয়োগ নীতি অবলম্বনে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রবাহ বাড়তে থাকে।

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়নে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

১. বিনিয়োগ ক্ষেত্রে শক্তিশালী সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনে উপরোল্লিখিত নীতিসমূহের সংস্করণ প্রক্রিয়া শুরু;

২. বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন- এসব রেগুলেটরি বডি/সংস্থাসমূহকে আরও দায়িত্বশীল, কার্যকর এবং সিদ্ধান্ত প্রদানে তৎপর করার পদক্ষেপ নেওয়া;

৩. উদ্যোক্তাদের/বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়িক প্লান্ট/শিল্প স্থাপনের খরচ/ব্যয় যুক্তিসঙ্গত করার প্রচেষ্টা;

৪. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশে উৎপাদন খরচ কম এবং শ্রম মজুরিও সস্তা। কিন্তু শক্তিশালী অবকাঠামোগত ব্যবস্থার অভাবে দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক জটিলতা/দীর্ঘসূত্রতার জন্য এ উৎপাদন খরচ অনেক সময় বেড়ে যায়– যা নির্মূল করার ব্যবস্থা নেয়া;

৫. আর্থিক খাতের তথা ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি, বীমা প্রতিষ্ঠান, মূলধন বাজারের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬. বিনিয়োগ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার পূর্বশর্ত হলো সু-ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে আর্থিক খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। সম্প্রতি দেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাতে বিনিয়োগকারীরা আরও উৎসাহিত হবেন। বাংলাদেশের জনভিত্তি এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ তহবিল উত্তরণে মুদ্রা বাজারকে চালিকাশক্তি হিসাবে ব্যবহার করা;

৭. 'Asymetric information' প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে এনে মুদ্রাবাজারকে দক্ষ করে তোলা এবং স্টক মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও সুবিধা নিশ্চিত করা।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি সরলীকরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ড এ ক্ষেত্রে তাদের নিবন্ধকরণ ও অন্যান্য সেবা/সার্ভিস প্রদান করে যাচ্ছে

২০০০ : সমস্যা যেখানে প্রকট, সমাধান সেখানেই শুরু– আপনি বলছেন অর্থনীতির গতি আগামীতে সুপারসনিক গতিতে যাবে– এ ধরনের মনে করার কারণ কী?

ড. আহমেদ : ১ নং প্রশ্নের উত্তরে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। তবুও কিছু যোগ করছি। বাংলাদেশ পৃথিবীর সীমিতসংখ্যক দেশের অন্যতম, যেখানে প্রবৃদ্ধির হার কোনও বছরেই 'ঋণাত্মক' হয়নি। হালনাগাদ কয়েক বছরে প্রবৃদ্ধির হার বেশ সন্তোষজনক। অতএব আমাদের যে সামর্থ্য (capacity) এবং সৃজনশীলতা আছে সেটাই আমাদের দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২০০০ : ব্যাংকিং সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে, সে-সবের সুফল সাধারণ মানুষ কবে থেকে, কীভাবে পাবে?

ড. আহমেদ : ১৯৯০ সালের শুরুতে আর্থিক খাত তথা ব্যাংকিং সেক্টরে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; আইন সংস্কার, নীতিমালা সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার এবং জাতীয়করণ অর্ডার, ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশোধন/পরিবর্তন করা হয়। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক তার কার্যক্রমে অধিকতর স্বাধীনতা পেয়েছে। সব ধরনের ঝুঁকি যেমন বৈদেশিক মুদ্রা হার ঝুঁকি, পরিসম্পদ/দায় ঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনাকে আরও সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর মূলধন ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করায় তাদের আর্থিক ভিত্তি আরও দৃঢ় হবে। অর্থঋণ আদালত আইন ১৯৯০-এর মাধ্যমে বকেয়া ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন আইন ২০০২ (যা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় আছে)

সম্পদের অবৈধ পাচার, সঞ্চয় ও স্থানান্তরকে বন্ধ করবে। নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ, বকেয়া ঋণ আদায়, ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণ, ঋণ অবলোপন, বৃহৎ ঋণ প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তবমুখী ও সুদূরপ্রসারী নীতিমালা গৃহীত হয়েছে।

ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সেবা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকের সুশাসন কাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে

ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সেবা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকের সুশাসন কাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে। তাদের উন্নত কার্যক্রমের উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতার মান চালু করে জনগণের কাছে আধুনিক পদ্ধতিতে তথ্যাদি প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালক, প্রধান নির্বাহী এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর জন্য যোগ্যতা ও উপযুক্ততা নিরূপণের নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও সদস্য সংখ্যার ওপর আরোপ করা হয়েছে কতিপয় নিষেধাজ্ঞা। পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ও দায়িত্ব সুস্পষ্ট এবং নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সংস্কারের ফলে ব্যাংকগুলোর ভিত্তি দৃঢ় হলে জনগণের আস্থা বাড়বে এবং আমানতকারীরা অধিকতর শঙ্কাহীন হবে। সুষ্ঠু ব্যাংকিংয়ের ওপর নির্ভর করে ঋণ প্রবাহ, যার ফলে বৃদ্ধি পায় কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা। দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের জন্য চাই দক্ষ আর্থিক খাত।

২০০০ : নির্ধারিত আয়ের মানুষ ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। এখানে সরকারের কী করণীয় আছে বলে মনে করেন?

ড. আহমেদ : আজকের এই সাক্ষাৎকারের ১নং প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলেছি যে, সরকার বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বিশেষভাবে খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি মুখ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে খাদ্যশস্য আমদানি গত বছরের এ সময়ের ৯.৫% বৃদ্ধির তুলনায় ১৬৪.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি/পদক্ষেপ যথাযথ কর্মশীল হওয়ার ফলে বেসরকারি খাতে ঋণ গত বছরের আলোচ্য সময়ে ১১৪২০.০ কোটি টাকা বৃদ্ধির তুলনায় চলতি বছরে বেড়েছে মোট ১৬৭৩৫.৪ কোটি টাকা, যাতে প্রকারান্তরে দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি যে সচল রয়েছে তা প্রতিভাত হয়।

অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক উৎপাদন সহায়ক মুদ্রানীতি ঘোষণার পর তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্বসহকারে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারও ইতিমধ্যে বোরো মৌসুমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত খাতে এবং অন্যান্য খাতে পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। অন্যান্য শস্য যেমন : ভুট্টা, সরিষা, শাকসবজি, মরিচ ও আলু উৎপাদনেও জোর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের ওপর সুদের হার কমানোসহ সময়মতো পর্যাপ্ত কৃষিঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর ওপর প্রয়োজনীয় তাগিদ অব্যাহত রেখেছে; বিশেষ করে প্রথমবারের মতো বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ১,৩০০.০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ প্রদান করাসহ মোট ৮৩০৮.৫৫ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪৫৫১.২৪ কোটি টাকা (৫৪.৮%) বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও ভালোমানের বীজের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উপকরণ বণ্টন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কৃষি খাত ছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা এবং মহিলা উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন বেসরকারি উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি গ্রহণ, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আমদানি পণ্যমূল্যে বাহ্যিক চাপ পরিহারের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ছাড়করণ, প্রস্তাবিত বিদেশি সহযোগিতা, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্গত এলাকাসহ সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয়ের ফলে দেশের বিরাজমান সাময়িক চাপ কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি (moderate growth rate) অর্জন করা সম্ভবপর হবে। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রেখে সর্বোচ্চ টেকসই পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি-পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

ইতিপূর্বেও আমি বলেছি যে, বর্তমানে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন নির্দেশকের বিশ্লেষণ অর্থনীতির কিছু খাতে (যেমন– রফতানি, কৃষি উৎপাদন, নির্মাণ খাত, এফডিআই) প্রবৃদ্ধির হার পূর্বের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম হলেও দেশের অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা বিরাজ করছে, আপনাদের এমন মন্তব্য সঠিক নয়। সার্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ, পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিকট ভবিষ্যতে আর কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে না হলে জনগণের টিকে থাকার প্রয়াসে দেশের অর্থনীতি মজবুত অবস্থানে, সহনীয় মূল্যস্ফীতি পর্যায়ে ফিরে আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না বলে আমরা আশাবাদী। তবে একটা বিষয়ে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে, সেটা হলো– আর্থিক ক্ষেত্রে নীতি ও কৌশলের ধারাবাহিকতা থাকতে হবে এবং সেটা সম্ভব হবে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায়। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধ যত দ্রুত সুসংহত হবে তত দ্রুত ব্যবসায়ী, শিল্প উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী (দেশি ও বিদেশি), কৃষক, শ্রমজীবী তথা সমগ্র জনগণের মধ্যে আস্থা ও কর্মউদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে- যা বাংলাদেশকে আগামী দশকের মধ্যেই মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে সহায়ক হবে।

পপুলার